



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 208 - 216

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা ছোটগল্প ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন

জিতব্রতা গুহ

কলেজ শিক্ষক ও গবেষক

সিকম ক্লিনস ইউনিভার্সিটি

Email ID : Jitabrota@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024

Selection Date 01. 02. 2025

Keyword

Bengali literature,
short stories,
Rabindranath
Tagore, magazine,
Anti-Scriptural
Movement, Anti-
fascist movement,
external reality,
Internal reality,
mysterious, bizarre.

Abstract

A certain art form of the short story was solidified in Bengali literature by the pen of Rabindranath Tagore in the last decade of the nineteenth century. The roots of that story-concept were also in the ideals of the modern short story that emerged in the first half of the nineteenth century. In the first half of the nineteenth century, a standard of structure and style for the short story was established in the writings of Washington Irving, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, and others. This influence continued in the second half of the nineteenth century in the writings of Maupassant and other European short story writers. Rabindranath was also a follower of that trend.

Overall, it can be said that this ideal was valid in Bengali short stories from the last decade of the nineteenth century to the first decade after independence. The social background has changed with the flow of time. Many new subjects have emerged as the basis of stories, and new types of characters have appeared in keeping with the times.

Stories published in magazines like 'Kallol' and 'Kalikalam' between 1923-30, which depict the cruel and difficult aspects of life. After 1930, the anti-fascist movement left an impact on Bengali short stories. The Second World War took place between 1939 and 1945. During this time, the Quit India Movement, the Partition of Bengal, and the form of capitalist exploitation emerged in Bengali short stories. Nevertheless, the original mold of the short story remained the same.

The social, political, and economic conditions of Bengal were extremely complex and turbulent during the 1950s, from 1950 to 1959. From the middle of this decade, some writers began to perceive life and the realities of life in a slightly different way. They tried to reflect reality in literature from a different perspective. A new trend in storytelling emerged.

The writers of this new trend, by defying the conventional structure of the short story, created a circle of light and darkness around the subtle layers of political and psychological nuances. Starting from the 1950s, stories were written in various new trends like 'Desh', 'Porichoy', 'Notun Sahitya', 'Sahityapatra' and others. A new style emerged in Bengali short stories, a new trend in storytelling.

In the 1960s, a few new writers started writing stories in a new way, rejecting the conventional story trend. A turning point occurred in Bengali short stories, and the new internal realism emerged. The writers of this magazine named their storytelling style 'anti-scriptural' stories. The writers of the 1950s had given a clear and artistic form to reality, but they did not completely abandon narration. They wrote diverse stories in their own way. However, the anti-scriptural writers completely rejected the narrative element in stories.

Some of these new storytellers included Ramananda Ray, Shekhar Basu, Kalyan Sen, Ashish Ghosh, Subrata Sengupta, Amal Chanda, Balaram Basak, Sunil Jana, and others.

A turning point occurred in Bengali short stories. Internal reality was expressed more than external reality. In these stories, the plot and characters did not develop following the logical path of everyday reality. The feelings and experiences of the human mind, gains and losses, and the discourse of light and darkness became the central themes of these stories. Sometimes they were mysterious, sometimes bizarre, and sometimes the storytelling technique was mechanical. A new approach emerged in the planning of the structure of these stories. These writers expressed the mental state of individuals and society as they wished, which was completely different from the conventional structure of short stories.

Discussion

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে যখন রেনেসাঁস অর্থাৎ পুনঃজাগরণের কাল শুরু হল তখন থেকে শিক্ষার প্রসারের ফলে মানুষের মনে জেগে উঠতে লাগল প্রশ্ন এবং যুক্তি। তখনই কথাসাহিত্যের সৃষ্টি। গদ্যে রচিত প্রথম আখ্যান হল ইতালির বোকাচ্চিও (১৩১৩-১৩৭৫) লিখিত শত গল্পসংকলন 'ডেকামেরন' (১৩৫৩)। প্লেগ পীড়িত দেশে একটি পুরনো বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া সাতজন নারী ও তিনজন পুরুষের প্রত্যেকের কথিত দশটি করে গল্প নিয়ে সংকলিত এই 'ডেকামেরন'। বোকাচ্চিও-এর এই গল্পগুলিকে আধুনিক কথাসাহিত্যের প্রথম সূচক বলা যায়। কিন্তু ছোটগল্প বলা যায় না।

আধুনিক ভাষায় যাকে 'Short Story' অর্থাৎ 'ছোটগল্প' বলা হয় তার প্রথম আবির্ভাব ঘটে আমেরিকায়। আমেরিকান সাহিত্যিক ওয়াশিংটন আর্ভিং (১৭৮৩-১৮৫৯)-এর লেখা 'রিপভ্যান উইন্কল' (১৮১৯) বিশ্বের প্রথম ছোটগল্প রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। তারপর রাশিয়াতে নিকলাই গোগল (১৮০৯-১৮৫২)-এর লেখা 'ওভার কোট' (১৮৪২) গল্পটি প্রকাশ পেয়েছিল। এই দুটি গল্পকেই একেবারে প্রথম পর্যায়ের কালোত্তীর্ণ ছোটগল্প বলা যায়। তবে আধুনিক ছোটগল্পের শিল্পসম্মত রূপটি ফুটে ওঠে আমেরিকার ন্যাথানিয়েল হর্থন (১৮০৪-১৮৬৪) - এর রচনায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পের সংকলন গুলি হল - 'Twice Told Tales', 'Mosses from an Old Man's' ইত্যাদি। এরপর থেকে আমেরিকায় ছোটগল্পের বৈচিত্র্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। আমেরিকান সাহিত্যিক এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯) লেখায় ফুটে ওঠে সার্থক ছোটগল্পের শিল্পরূপ। তারপর অন্যান্য দেশেও ছোটগল্প প্রচলিত হয়।

বাংলা সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে 'হিতবাদী' (১৮৯১) পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) - এর 'দেনাপাওনা' (১৮৯১) গল্পটিকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্প রূপে ধরা হয়। উনিশ শতকের শেষ দশকে 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকার পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রথম পর্ব (১৮৯১-১৯১০); 'সবুজপত্র' (১৯১৩-১৯২১) পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথের গল্পের এক ধারা দেখা যায়। বাঙালির সব রকম জড়তা, কুসংস্কারের বিরোধিতা করে জন্ম নেয় প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পত্রিকাটি। এই পত্রিকাটিকে অবলম্বন করে ছোটগল্পের নতুন ধারার সূচনা হয়। 'সবুজপত্র' পত্রিকার হাত ধরেই বাংলা সাহিত্য সাধু ভাষার প্রভাবমুক্ত হয় এবং বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রচলন ঘটে। চলিত ভাষাতেও যে মার্জিত রচনাসম্মত সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে তার পথপ্রদর্শক প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর 'সবুজপত্র' পত্রিকা।

১৯২৩-৩০ এর মধ্যে ‘কল্লোল’, ‘কালিকলম’ ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প যেগুলিতে জীবনের নিষ্ঠুর ও কঠিন রূপ ফুটে উঠেছে। ১৯৩০-এর পর ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাপ পড়েছে বাংলা ছোটগল্পে। ১৯৩৯-১৯৪৫ - এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে, তার পাশাপাশি ভারতছাড়ো আন্দোলন, মন্বন্তর, পুঁজিবাদী শোষণ, দেশভাগ এবং দাঙ্গার স্বরূপ ফুটে উঠেছে বাংলা ছোটগল্পে।

ছোটগল্পের এক ধরনের শিল্পরূপ বাংলা সাহিত্যে স্থির হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলমে উনিশ শতকের শেষ দশকে। সেই গল্প-ধারার মূলেও ছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গড়ে ওঠা আধুনিক ছোটগল্পের আদর্শ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ছোটগল্পের গঠন-রীতির একটা আদর্শ তৈরি হয়ে গিয়েছিল ওয়াশিংটন আর্ভিং, ন্যাথিয়াল হথর্ন, এডগার অ্যালান পো প্রমুখের লেখায়। তারই অনুবৃত্তি চলেছিল উনিশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে মাপাসাঁ সহ অন্য ইউরোপীয় ছোটগল্পকারদের কলমে। বাংলা সাহিত্যের লেখকেরা সেই ধারারই অনুসারক ছিলেন। এই গল্পের মূল ভাবনা ছিল দুটি — এক, বাস্তব জগতের একটি আখ্যান নিয়ে একটিমাত্র বক্তব্য বা অনুভবকে অনুকরণ করে গড়ে উঠবে ছোটগল্প। দুই, সেই গঠনে থাকবে না কোনো বাহ্যিক কথন। সময়-প্রবাহের সঙ্গে সামাজিক পটভূমি পরিবর্তিত হয়েছে। গল্পের অবলম্বন রূপে উঠে এসেছে অনেক নতুন বিষয়বস্তু, সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেখা দিয়েছে নতুন ধরনের চরিত্র। তাসত্ত্বেও ছোটগল্পের আদি ছাঁচটা থেকে গিয়েছিল একই রকম। সেই ধারাতেই প্রথম অন্য পথে দিশা নিয়ে এলেন পাঁচের দশকের মধ্যবর্তীকালে কয়েকজন গল্পকার।

পাঁচের দশক অর্থাৎ ১৯৫০ থেকে ১৯৫৯ এই সময় বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল ও আবর্ত সংকুল। তার প্রধান কারণ ছিল দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বহু বাঙালি পরিবার সবকিছু হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসা। এই পাঁচের দশকেই মাঝামাঝি সময় থেকে কয়েকজন লেখক একটু অন্যভাবে জীবনকে এবং জীবনের বাস্তবতাকে অনুভব করতে শুরু করলেন। ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যে বাস্তবকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করলেন। নতুন এক গল্পধারার সম্ভাবনা দেখা দিল। গল্পগুলি সমাজ বাস্তবতা থেকে উঠে এসেছে, কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর গুলিকে ঘিরে রচনা করেছে আলো-অন্ধকারের এক বৃত্ত।

পঞ্চাশের দশক থেকে কোনো কোনো লেখক বাস্তবতাকে দেখলেন মননের দৃষ্টিতে, - এই বাস্তবতা যেন এক উত্তর বিহীন জিজ্ঞাসা। এক অর্থে গল্প ধারায় পরিবর্তন হল। চিরাচরিত বাস্তব দর্শনে দেখা দিল অচিরাচরিত অভিক্ষেপণ এবং নতুন প্রকরণ। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে ‘দেশ’, ‘পরিচয়’, ‘নতুন সাহিত্য’, ‘সাহিত্যপত্র’ ইত্যাদি একাধিক নতুন ধারায় গল্প লেখা হল। এই গল্পগুলো ক্রমে পাঠকদের আকৃষ্ট করে তুলল। বাংলা গল্পে এল নতুন রীতি অর্থাৎ গল্পের নতুন ধারা। বাস্তবকে বহু কৌণিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার চেষ্টা এবং এক অবয়বহীন বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে লেখক তাঁর মনের ইচ্ছানুভূতি দিয়ে গল্প লিখলেন, যা বাংলা-সাহিত্যে এতকাল ছিল না। তাসত্ত্বেও ছোটগল্পের আদি ছাঁচটা থেকে গিয়েছিল একইরকম।

যদিও এই ঘটনা একই সঙ্গে লেখক ও পাঠকদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে প্রথাসিদ্ধ কাঠামোর বাইরে নতুন ধরনের কাঠামো তৈরি করা গল্পের ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। এই বিশ্বাস জাগ্রত হবার ফলেই পাঁচের দশকের শেষ থেকে কথাসাহিত্যে ভিন্ন ধরনের শৈল্পিক অবয়বের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠল। বিশ্ব-সাহিত্যে বিশ শতকের প্রথমার্ধে চেতনা-প্রবাহ রীতির আবির্ভাব এবং দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাজিক রিয়ালিজম-এর নতুন শিল্প-ভাবনা লেখকদের মনের এই নতুন প্রবণতাকে উৎসাহিত করল। এই সব কিছুই সম্মিলিত ফল বাংলা ভাষায় ষাটের দশকে শাস্ত্র-বিরোধী গল্পধারা।

ষাটের দশক থেকে বাংলা ছোটগল্পে একদল নতুন গল্পকার তাঁদের নতুন গল্প-ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁরা একটি নতুন পত্রিকায় নিজেদের নতুন চিন্তার কথা ঘোষণা করলেন। এই পত্রিকাটির নাম ‘এই দশক’। এই নামে একটি বুলেটিনও তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন। বুলেটিনটি অনিয়মিতভাবে ১৯৬২-১৯৬৬ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর ‘এই দশক’ পত্রিকাটি ১৯৬৬-১৯৭৬ পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পরে এটি অনিয়মিত ভাবে দুই একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হতে থাকে, তারপর ১৯৮১ তে এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকার লেখকরাই তাঁদের গল্প রীতির নাম দিয়েছিলেন ‘শাস্ত্র-বিরোধী’ গল্প। যদিও সমকালীন লেখকগোষ্ঠী প্রথমেই তাঁদের খুব বেশি গুরুত্ব দিতে চাননি। কারণ তাঁরা সাধারণ

পাঠকের প্রথাসিদ্ধ গল্প-রুচিকে যেমন তৃপ্ত করতে চাননি, তেমনই পাঠকরাও এই গল্পগুলি থেকে নিজেদের চাহিদা মেটাতে পারেননি। তাই সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁরা খুব বেশি গ্রহণীয় হয়ে ওঠেননি। কিন্তু তাঁদের এই গোষ্ঠীবদ্ধ প্রয়াস বাংলা ছোটগল্পের প্রচলিত ধারাকে যথেষ্ট আঘাত করেছিল। পঞ্চাশের দশকের নতুন ধারার গল্পের মূল অবলম্বন ছিল বাস্তবতার বহুরূপ। শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারগণ বলেছিলেন -

“আমাদের সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা করা হয়। বলা হয়, আমরা প্রতিষ্ঠান বিরোধী। না আমরা প্রতিষ্ঠান বিরোধী নই। আমরা শাস্ত্রবিরোধী। আমরা সাহিত্যের প্রচলিত নিয়ম-নীতিগুলিকে উল্টে দিতে চেয়েছিলাম। ...শাস্ত্রবিরোধিতা আর প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শাস্ত্র মানে অনুশাসন, নিয়ম-কানুন। আমরা এর বিরোধী ছিলাম।”^১

পঞ্চাশের দশকের লেখকেরা বাস্তবকে স্বচ্ছ নমনীয়তার শিল্পসম্মত রূপ দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা আখ্যান সম্পূর্ণ ত্যাগ করেননি। তাঁরা নিজের নিজের মতো করে বহু বৈচিত্র্যময় গল্প লিখেছেন। কিন্তু লেখকগণ গল্পে সম্পূর্ণভাবে আখ্যানধর্মিতাকে অস্বীকার করলেন। এই নবীন গল্পকারদের মধ্যে ছিলেন- রমানাথ রায়, শেখর বসু, কল্যাণ সেন, আশিস ঘোষ, সুব্রত সেনগুপ্ত, অমল চন্দ, বলরাম বসাক, সুনীল জানা প্রমুখ।

বাংলা ছোটগল্পের আবার বাঁকবদল ঘটল। বহির্বাস্তবতা থেকে অন্তর্বাস্তবতা বেশি প্রকাশ পেল। শাস্ত্রবিরোধী গল্প সম্পর্কে শেখর বসু বলেছেন -

“শাস্ত্রবিরোধী লেখকেরা গল্পই লিখেছিলেন। তবে প্রচলিত গল্পের সঙ্গে তার তেমন কোন মিল ছিল না। অমিল কোথাও - কোথাও খুব বেশি মাত্রার। ...গল্পের বিচিত্র কাহিনী নিয়ে যে কৌতূহল ও রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, গল্প শেষ হওয়ার আগে তার থেকে মুক্তি নেই। ...ছোটগল্পের এই ধারণাটি শুধু উনিশ শতক নয়, বিশ শতকেও দীর্ঘ সময়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে কিছু লেখক মানসিক অভিজ্ঞতার প্রবাহকে ধরার প্রথম সচেতন চেষ্টা করেন। যাত্রা শুরু হয়েছিল মানুষের গভীর থেকে আরও গভীরে যাওয়ার। শেষে বিস্ময়কর অবচেতনায়। এই রাজ্যের অভিজ্ঞতা অনন্ত এবং অসম্পূর্ণ। সেকেলে প্লট বা মোটা দাগের গল্পের রূপরেখা এখানে একেবারে অচল। একান্ত এই অন্তর্জগতকে শিল্পসাহিত্যে যিনি তুলে আনছেন তিনিও আবার সাধারণ মানুষ।”^২

এইসব গল্পে কাহিনী ও চরিত্র প্রাত্যহিক বাস্তবতার যুক্তিগ্রাহ্য পথ ধরে গল্পে বিকশিত হল না। মানবচিন্তার অনুভূতি-অনুভব, পাওয়া - না পাওয়া, একটা আলো-আঁধারের বক্তব্য এই গল্পগুলির কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠল। কখনো তা রহস্যময়, কখনো উদ্ভট, কখনো গল্পের শিল্পরীতি হয়েছে যান্ত্রিক ছকে। এই গল্পগুলি নতুন ধরনের হলেও তা বাস্তব বর্জিত নয়। সামাজিক শ্রেণি - বৈষম্য, অর্থনৈতিক অসাম্য, লোভ-লালসা, যৌনতা - সর্বোপরি সামাজিক অনিশ্চয়তাই এই গল্প গুলির উৎস। কিন্তু নতুনত্ব দেখা দিল গল্পগুলির গঠনের পরিকল্পনায় সামাজিক পরিস্থিতি জাত ব্যক্তির মনোভাবকে এই লেখকেরা যেমন ইচ্ছে তেমনভাবে প্রকাশ করলেন। কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি একেবারেই অবলম্বন করলেন না।

শাস্ত্র-বিরোধিতার সঙ্গে শাস্ত্র-ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এই শাস্ত্রবিরোধিতা মানে শিল্পসাহিত্যের গোঁড়ামি, নিয়মাবলি, সংস্কারের বিরোধিতা। অর্থাৎ শাস্ত্রবিরোধী লেখকগণ সাহিত্যে এতদিন ধরে যা প্রচলিত ছিল তাকে মানেন না। তাঁরা তাঁদের মতন করে গল্প লিখতে চান। তাঁদের লেখা এই ছোটগল্প গুলিকেই তাঁরা নাম দিয়েছিলেন ‘শাস্ত্রবিরোধী’ গল্প। শাস্ত্রবিরোধী কথাটার মধ্যে রয়েছে প্রথাভাঙা ইঙ্গিত। এতদিন ছোটগল্প সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা ছিল তাকে ভেঙে দেয়ার ইঙ্গিত। নিয়মসিদ্ধ বা প্রথাসিদ্ধ গল্পের প্লট কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল ছিল। ‘এই দশক’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, ১৯৬৬) শাস্ত্রবিরোধী লেখকগণ ঘোষণা করেছিলেন -

১. গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব।
২. আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লাস্ত।

৩. অতীতের মহৎ সৃষ্টি অতীতের কাছেই মহৎ আমাদের কাছে নয়।

৪. গল্পে এখন যারা কাহিনী খুঁজবে তাদের গুলি করে মারা হবে।

অন্যের কথা বলার জন্য তাঁরা গল্প রচনা করবেন না। তাঁরা গল্পে নিজেদের কথা বলবেন। প্রথাসিদ্ধ গল্পে কাহিনীর যে জাল বোনা হত সেখান থেকে তাঁরা গল্পকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। অন্তর্জগৎ সবসময় বাস্তবের সঙ্গে চলে না। আমরা এমন অনেক কাজ করি যার কোন কারণ নেই। শিল্পী তাঁর অন্তর্জগৎ থেকে শিল্পসাহিত্য সৃষ্টি করেন। এই শাস্ত্রবিরোধী লেখকগণ সাহিত্যে বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে একটা ফ্যান্টাসির জগৎ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা সাহিত্যে বহির্জগতের বাস্তবতা ছেড়ে অন্তর্জগতের কথা বলতে চাইলেন। ‘এই দশক’ পত্রিকায় লিখলেন -

“ছোটগল্প আজ থেকে সমস্ত শর্তের বিরুদ্ধে। সমালোচকের সমস্ত সংজ্ঞার বেড়ি ভেঙে সে বেরিয়ে এসেছে। ছোটগল্প এখন কবিতার মতোই স্বাধীন ও মুক্ত। আমরা যা লিখব, যেমন করে লিখব তাই ছোটগল্প। শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা বাউল। আমরা শাস্ত্রবিধি মানিনা।”^৩

সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকের প্রচলিত ধারণাকে উড়িয়ে তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত মনে নতুনভাবে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। তাঁদের কাছে সং-অসং, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি শব্দগুলি ছিল অর্থহীন, রীতিমতো সংস্কারাচ্ছন্ন এবং বিরক্তিকর। তাঁরা এই ধারণাগুলির বিরোধী ছিলেন। তাঁরা শাস্ত্র-বিরোধিতা বলতে বোঝাতে চেয়েছিলেন-

১. ছোটগল্পকে কোনো শর্তের মধ্যে বাঁধা যাবে না। তাঁরা যা লিখবেন, যেমন করে লিখবেন তাই ছোটগল্প।

২. কোনোরকম সামাজিক দায় থেকে তাঁরা ছোটগল্প লিখবেন না।

৩. আন্তরিক জীবন থেকেই গল্পের বিষয় তৈরি হবে।

৪. লেখক গল্পে কোনোরকম জ্ঞান বা বক্তব্য প্রচার করবেন না।

৫. তাঁদের মতে ছোটগল্পের ভাষা হবে সহজ, সরল, কৃত্রিমতা শূন্য, মিশ্র, অস্পষ্ট।

৬. সাজানো-গোছানো নাটকীয় ঘটনা সমৃদ্ধ ছোটগল্প তাঁরা লিখবেন না। জীবন এইভাবে চলে না। জীবন কখনো তা একঘেয়ে, এলোমেলো, যুক্তিবিরোধী - সেই কারণে গল্পের বিষয়বস্তুও তাই হবে।

৭. গল্পের চরিত্র তথাকথিত স্বাভাবিক চরিত্র হবে না।

৮. লেখক ঈশ্বর নন। তিনি শুধু তাঁর অনুভবের জগৎকেই প্রকাশ করবেন। তিনিও একজন সাধারণ মানুষ।

৯. কোনো ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি বা বিশেষ কোন মতবাদ নয়, লেখক তাঁর অন্তরাত্মার কথা বলবেন।

১০. গল্পের দাবি অনুযায়ী আঙ্গিক গড়ে উঠবে।

‘শাস্ত্র বিরোধী’ লেখকরা প্রকৃতপক্ষে কারুর বিরোধী ছিলেন না। তাঁরা ‘এই দশক’ পত্রিকাকে অবলম্বন করে স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাচারী গল্প রচনা করেছেন। এই লেখকদের সাহিত্য সম্পর্কে যে ধারণা ছিল সেই মানসিকতা থেকেই তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন। শাস্ত্রবিরোধীরা বিশেষভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান বিরোধী ছিল না। তাঁরা সাহিত্যের প্রচলিত নিয়ম-নীতিগুলিকে উল্টে পাল্টে দিতে চেয়েছিলেন। যেহেতু পরবর্তীকালে অনেকে ‘শাস্ত্রবিরোধী’ শব্দটির বদলে প্রতিষ্ঠান বিরোধী শব্দটির ব্যবহার করেছেন তাই এই ভ্রান্তি। শাস্ত্র-বিরোধিতা আর প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা ভিন্ন। শাস্ত্র মানে অনুশাসন, নিয়ম-কানুন। এই শাস্ত্র-বিরোধী লেখকরা সাহিত্যের এই নিয়ম-কানুন, অনুশাসনের বিরোধী ছিলেন। রমানাথ রায় বলেছেন -

“আমরা চাই স্বাধীনতা, পূর্ণ স্বাধীনতা। আমরা তাই শাস্ত্র খাড়া করি না শাস্ত্রের কাজ নিয়ম তৈরি করা, আমাদের কাজ নিয়মকে ভেঙে দেওয়া।”^৪

প্রচলিত বা প্রথাসিদ্ধ সাহিত্যের প্রতি শাস্ত্রবিরোধী লেখকদের বীতশ্রদ্ধা ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও দাঙ্গার ইতিহাসের মধ্যে কিছুটা হলেও নিহিত ছিল। এই লেখকদের প্রায় প্রত্যেকেই জন্ম ১৯৩৯-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। যারা

স্বাধীনতার স্বাদ যেমন পেয়েছেন, তেমনই দেখেছেন প্রথাগত বা প্রচলিতকে ভেঙে ফেলার দৃশ্য। ফলে স্বাধীনতা এঁদের কাছে ছিল রক্তাক্ত ও স্বাদহীন, কিন্তু নতুন। আবহমানকাল ধরে বসবাস করা মানুষ নিজ ভিটে-মাটি-জল-হাওয়া ছেড়ে, শিকড় ছিঁড়ে অনিশ্চয়তার পথে পাড়ি দিয়েছে। স্থান পেয়েছে রেলস্টেশন, জলাভূমি, পরিত্যক্ত স্কুল বাড়িতে। চারিদিকে শুধু না পাওয়ার হাহাকার। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা অসহায় মানুষেরা স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিলেও এই শিকড় ছেঁড়া মানুষগুলোর যন্ত্রণা উপশম করতে পারেনি স্বাধীন ভারতবর্ষ। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে তখন ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল উদ্বাস্তু সমস্যা এবং খাদ্য-সঙ্কট। এরকমই যন্ত্রণাদায়ক পরিবেশের মধ্যে এই শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনকারী লেখকদের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। সেই কারণেই হয়তো তাঁদের মধ্যে প্রচলিত সবকিছুকে নস্যাৎ করে স্বাধীন হওয়ার প্রবণতা এবং তারই ফসল শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন।

শাস্ত্রবিরোধী লেখক রমানাথ রায়ের ‘বলার কথা’ (১৯৬৬) গল্পটির মধ্যে দেখা যায়, একজন ব্যক্তি কিছু বলতে চায়। কিন্তু বলতে গেলেই তার চার ফুট দেহ দেড় ফুট হয়ে যায়, জিভ জড়িয়ে যায়, তাই সে ঠিক করে সে যা বলবে তা লিখেই বলবে। তাতেও রেহাই পেল না। মধ্যরাতে সে লিখতে গিয়ে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ল। তার মনে হল –

“বালিশ কাঁথা ঘুরতে লাগল তক্তপোশ দুভাগ হয়ে ঘুরতে লাগল টেবিল দুভাগ হয়ে ঘুরতে লাগল তক্তপোশের চারটে পা চারিদিকে ঘুরতে লাগল টেবিলের চারটে পা চারিদিকে ঘুরতে লাগল ড্রয়ার ঘুরতে লাগল কাগজ ঘুরতে লাগল কলম ঘুরতে লাগল আমার দু পা দুদিকে ঘুরতে লাগল আমার মাথা ঘুরতে লাগল আমার ধড় ঘুরতে লাগল।”^৫

গল্পটিতে দাড়ি, কমা বা কোনো যতি চিহ্ন নেই। অথচ গল্পে ভাষার সঙ্গে ভাবনার অসঙ্গতি নেই। কিছু বলার অস্থিরতা থেকেই গল্পটি উঠে এসেছে। পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে নিপীড়িত সাধারণ মানুষ কিছু বলতে চান কিন্তু পারেন না। কথাগুলো না বলাই থেকে যায়।

রমানাথ রায়ের ‘গোগো’ (১৯৭০), ‘গিলিগিলি’ (১৯৭৫) প্রভৃতি গল্পে বাস্তবতার সমস্যা, সংকট অনুপস্থিত হলেও লেখক স্বচ্ছন্দে নিজের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করেছেন। আর এখানেই গল্পগুলি প্রথাসিদ্ধ গল্প থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র। শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলির কথনরীতি, স্থান-কাল-কাঠামো, আঙ্গিকের মধ্যেই ছিল স্বাতন্ত্র্যের ছাপ। রমানাথ রায়ের ‘বলার কথা’ গল্পটির মধ্যে একজন বেবাক মানুষের কতগুলো অস্ফুট ধ্বনি, মুদ্রা বা ভঙ্গি ছাড়া বলার জন্য আর কিছুই নেই। পুরো গল্পটা জুড়ে অর্থের শূন্যতা। ‘গিলিগিলি’ গল্পটিতে গিলি গিলি শব্দটির কোন অর্থ নেই। এটি জাদুতে ব্যবহৃত হওয়া একটি শব্দ। যা অঘটনের সম্ভাবনার সঙ্গে জড়িত। যা এক ধরনের তাৎপর্যহীন, অলীক বা ভেনিস হয়ে যাওয়া অস্তিত্ব বোধের অর্থকেই ইঙ্গিত করে।

আশিস ঘোষের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টির এক চেহারা দেখা যায় ‘সাইকেল’ (১৯৬৮) গল্পটিতে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র একজন মোটর সাইকেল চালক। যেখানে যত রেস হয় তিনি সেখানেই সাইকেল চালাতে চলে যান। প্রথম হওয়া তো দূরের কথা কোনদিনই সে পুরস্কার পায় নি। কিন্তু তবুও সে তার চেষ্টা ছাড়ে না। সাইকেল চালানোই তার একমাত্র ভালোবাসা। সে প্রতিযোগিতায় নাম দেয় ঠিকই কিন্তু সেই প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়ার তার একমাত্র উদ্দেশ্যই সাইকেল চালানো। তাকে কোনদিন কেউ হাঁটতে দেখেনি। সবসময়ই মোটর সাইকেলেই তাকে দেখা যায়। গল্পের শেষেও হয় তার প্রতিযোগিতায় সাইকেল চালানোর প্রচেষ্টা দিয়েই। ‘সাইকেল’ গল্পটির বয়স্ক ব্যক্তির চরিত্রটি অন্য রকমের। সে কোনদিন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পায় না, তবুও তার উৎসাহের অভাব নেই। চেষ্টার অভাব নেই। ব্যর্থ হয়েও তিনি ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে পরাজয় স্বীকার করেন না। তিনি পরাজয়ের পরেও উঠে দাঁড়ান, আবার এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন, আবার চলতে থাকেন – এটাই হয়তো আমাদের জীবন। এই চলার মধ্যেই আনন্দ।

সুব্রত সেনগুপ্ত এই একই আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য লেখক। তাঁর ‘চারিদিক’ (১৯৬৬) গল্পটি শুরু এবং শেষ অনুভবের জগতে। গল্পের ‘সে’ বাসস্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। কিসের স্বাদ, কিসের শব্দ শুনতে পেলেও আস্তে আস্তে তার পঞ্চেন্দ্রিয় চলে গিয়েছিল। পরে সেগুলি ফিরে এলেও মানুষটির বিভ্রান্তি দূর হয়নি। সুব্রত

সেনগুপ্তর আরও একটি গল্প ‘জামা’ (১৯৬৬)। একটি জামা কেনার ঘটনাকে গল্পটির মুখ্য বিষয়। একটি জামা কিনে গিয়ে দিলে আশেপাশের সবকিছু সুন্দর হয়ে ওঠে। জামা পড়ে গল্প কথকের নিজেকেই এতটা সুন্দর, স্মার্ট মনে হচ্ছিল, যে তার ইচ্ছে করছিল শিশু দিতে। কথকের পরিচিত অমিয় এই জামাটা পড়ে কথককে দেখে বলেছিল –

“এই জামাটায় তোমার স্মার্টনেস অন্তত পনেরো পার্সেন্ট বেড়ে গেছে।”^৬

কিন্তু বাড়ি ফিরে মায়ের মলিন মুখ দেখে সেই মানুষটির আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরলেও শেষে জামাটিই গল্পের চরিত্রটিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সুব্রত সেনগুপ্তর গল্পে বাইরের ঘটনা খুবই সামান্য। কিন্তু অন্তর্জগতের সংঘাত তীব্র।

অমল চন্দ্রের ‘বারান্দা’ (১৯৬৬), ‘ঘরে’ (১৯৬৬) ইত্যাদি গল্পগুলি ছোট আকারের দু-তিন পাতার। ‘বারান্দা’ গল্পটিতে একজন ক্লান্ত বিপর্যস্ত ব্যক্তি তার গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছে ঘরের লাগোয়া ছোট একটি বারান্দায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। সংসারী এই মানুষটি সংসারের বিভিন্ন কাজে আবদ্ধ হয়ে বারান্দার দিকে তাকাতে পারে না। অথচ সংসারের বেড়ালাল থেকে মুক্তির খোঁজে সে বারান্দায় যেতে চায়, ক্লান্ত, বিপর্যস্ত মানুষটি ঘরের লাগোয়া বারান্দার যাওয়ার স্বপ্ন দেখেই জীবন কাটিয়ে দেয়। শুধু ভাবে –

“বারান্দা, আমার বারান্দা, আমি একদিন বারান্দায় চলে যাবো।”^৭

কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। ‘ঘরে’ গল্পটিতেও ঘরের মধ্যে বাইরের মৃদু কখনো আবার জোড়ালো শব্দ ভেসে আসে। সেই ঘরে একটি মানুষ তক্তাপোশে বসে, শুয়ে, সিগারেট খেয়ে, চিন্তা ভাবনায় ডুবে থাকে। এই ভাবেই গল্পটি শেষ হয়।

শেখর বসুর ‘অথচ’ (১৯৬৮) গল্পে চরিত্রদের নাম নেই। ব্যক্তির প্রশ্ন তীব্র না হয়েও অনুভবের তীক্ষ্ণতা পাঠক বুঝতে পারে। দ্বন্দ্ব ও অনুভবের স্তর বিন্যাস এ গল্পে বড় হয়ে উঠেছে। লেখকের একটি অনবদ্য অনুভূতির গল্প ‘সার্সি’ (১৯৬৮)। গল্পটিতে পাহাড়ের উপর একটি ঘর এবং বাইরে অঝোরে পড়া বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। সেই ঘরে একটি মাত্র জানালা। সেই জানালায় সার্সি দেওয়া। এক ব্যক্তি থাকে লেখক ‘সে’ বলেছেন তিনি শুধু ঘরের মধ্যে থেকে জানালার সার্সি দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে। পুরো গল্পটা ঘিরেই ‘সে’-এর অনুভূতি, একাকীত্ব, ক্লান্তি –

“পাহাড়ের গায়ে মাথায় ঘন কুয়াশা। কুয়াশা দুলছে-কুয়াশা চলছে। ডানদিকে থেকে বাঁদিকে আবার বাঁদিক থেকে ডানদিকে। খুব পাতলা মেঘের মতো। তবে মেঘে যেমন ছবি তৈরি হয়- নানা ধরনের ছবি - তেমন ছবি কুয়াশায়! ...পাহাড়ের উঁচু - নিচুতে সবুজ। কালচে সবুজ। খুঁটিয়ে দেখার আগেই আবার গাঢ় কুয়াশা সব ঢেকে দিচ্ছে। কুয়াশার সামনে, বৃষ্টি পড়ছে। সামনে ঝিরিঝির করে। কুয়াশার ভেতরে বৃষ্টি।”^৮

পাহাড়ের এই বর্ণনা রিয়ালিটিতে স্পর্শ করে। এর অনবদ্য বর্ণনা পাঠককে পাহাড়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। একটা অনুভূতির মধ্যে দিয়ে পাঠক বৃষ্টিপ্লাবিত পাহাড়ের ছবি দেখতে পান। এইভাবেই গল্পটি এগিয়ে চলে।

কল্যাণ সেনের ‘ক-চ-ট-ত-প’ (১৯৭২) গল্পটি অন্য মাত্রার গল্প। টেবিলের একদিকে গল্পের ‘আমি’ আরেকদিকে এক ভদ্রলোক। গল্পটি স্টিল ছবির মতো লেখা। গল্পে কোনো কাহিনী বা কাহিনীর আভাস নেই। শুধু উত্তম পুরুষ চরিত্রটির চিন্তাভাবনা বর্ণনা। গল্পের শেষে লেখকের বর্ণমালার অর্থহীন প্রয়োগ গল্পটিকে অর্থবহ করে তুলেছে।

বলরাম বসাকের ‘ডিম’ (১৯৭০) গল্পটিতে ‘হাতুড়ি ঠোকার শব্দ’, ‘পোড়া কাঠি’ এই শব্দগুলি ফুরিয়ে যাওয়ার প্রতীক। ‘ডিম’ শব্দে অশুভিষ্ম অর্থাৎ শূন্যতাকে বা না পাওয়াকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু লাইনগুলি বদলে দিলে গল্পটিতে কোন বক্তব্য নেই। শুধু গল্পের মধ্যে আছে একটি গুঞ্জরণ - যা একান্তভাবেই শুধুমাত্র ফর্মের জন্য। বলরাম বসাকের ‘কার্পেট’ (১৯৬৮) গল্পটি এক অভিনব প্রচেষ্টায় লেখা। শব্দগুলো এখানে গল্প তৈরি করেছে। গল্পটিতে কোনো কাহিনী নেই শুধু শব্দ জুড়ে জুড়ে গল্প এগিয়ে গেছে। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী, প্রকৃতি, বিভিন্ন মানুষের অনুষ্ণ এনে শব্দ সাজিয়ে গল্প বলেছেন লেখক। কোনো ঘটনা, কাহিনী বা চরিত্রের আভাস মাত্র নেই গল্পটি পড়ার পর পাঠকের মনে কোনো অনুভব ও অনুভূতির জন্ম নেয় না। সমগ্র গল্প জুড়ে যেন অর্থহীনতার ছবি -

“বারান্দা পাতা পাতা পাতা ফুল পাতা পাতা
পাতা পাতা পাতা ফুল পাতা
কালো ছায়া সাদা সাদা সাদা
দেয়াল
আলমারি
বই বই বই বই বই বই বই বই ...”^৯

বলরাম বসাক তাঁর ‘কার্পেট’ গল্পে এলোমেলো শব্দ সাজিয়ে গল্প লিখেছেন।

সুনীল জানার গল্পেও গল্পহীনতা এবং বিবৃতি মুখ্য কথনরীতি থেকে সরে এসে প্রথাভঙ্গার ইঙ্গিত রয়েছে। ‘সাক্ষাৎকার-২’ (১৯৬৯) গল্পটির শুরু কথককে এক অজানা ব্যক্তির খোঁজ করতে আসা দিয়ে। এক একজন ব্যক্তি গল্প-কথককে খুঁজতে আসছে কিন্তু কোনোবারই কথকের সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে না। কথকের বাড়ি, চায়ের দোকান, অফিস সব জায়গাতেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কথককে খুঁজে যাচ্ছেন আলাদা আলাদা পোশাক পরে কিন্তু কারোর সঙ্গেই তার দেখা হচ্ছে না। গল্পের প্রথম থেকেই এক রহস্য যেন দানা বেঁধেছে। কথক সেই অজানা লোকটির জন্য অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও কেউ এলো না কথকের সঙ্গে দেখা করতে। গল্প-কথকের অপেক্ষা, সংশয়, চিন্তা, উদ্বেগ দিয়ে গল্প শেষ হয়েছে। এছাড়াও লেখকের ‘কম্পোজিশন-১’ (১৯৭০), ‘ঘটনা’ (১৯৭১) প্রভৃতি গল্পের বিষয়ভঙ্গি, বিন্যাস প্রচলিত গল্পের ধারা থেকে অনেক আলাদা।

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় শাস্ত্রবিরোধী গল্পের আন্দোলন সময়ের দিক থেকে খুব দীর্ঘস্থায়ী না হলেও, বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অভিঘাত রেখে গেছে। শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারেরা বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে গল্প লেখা শুরু করলেও তাঁরা অধিকাংশই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও গল্প লিখে গেছেন এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের গল্পকারদের সৃষ্টির ধারার সঙ্গে মিশে গেছে। বাংলা গল্প সাহিত্যের সুদীর্ঘ পূর্ববর্তী ধারায় যে ঘটনা নির্ভর প্লট, আদি, মধ্য, অন্ত সম্বলিত আখ্যান চরিত্র নির্মাণের প্রথাসিদ্ধ রীতি এবং সমাজ সম্মত ও বাস্তবসম্মত পরিমণ্ডল গড়ে তোলা - এই প্রতিটি প্রচলিত পদ্ধতিকে তাঁরা ভেঙে দিয়েছিলেন। তার ফলে পরবর্তী প্রজন্মের গল্পকারদের সামনে এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত হয়ে যায়, যেখানে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলার কোনো অনুশাসন রইল না। আক্ষরিক অর্থে লেখকেরা যেমন ভাবে খুশি গল্প লেখার স্বাধীনতা অর্জন করলেন।

অবশ্য সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন, প্রথাসিদ্ধ, আখ্যান সর্বস্ব গল্পের একটি ধারা সবসময় সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত। এই ধারাটিকে আমরা বাণিজ্যিক ধারা বলে থাকি। এই ধারাতেও ভালো গল্প লেখা হয়। কিন্তু সেই ধারায় মানুষের সমাজ মনস্তত্ত্ব এবং ব্যক্তিমনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সন্ধান প্রায়শই থাকে না। এই প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন -

“সব মিলিয়ে শাস্ত্র-বিরোধী গল্প এবং নব্য অন্তর্বাস্তবতার গল্প বাংলা সাহিত্যের গতিপথে অনুপেক্ষণীয় একটি বাঁকবদল সৃষ্টি করেছে। যদিও ষাটের দশক থেকে স্ফীত হয়ে ওঠা বাণিজ্যিক গল্পধারার পাশে তা স্ফীনস্রোত এবং স্বাভাবিকভাবেই বৃহত্তর সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছাতে তেমন সমর্থ হয়নি। কিন্তু সে-কথা সব দেশে, সর্বকালে জনপ্রিয় ধারা-বিরোধী লেখকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।”^{১০}

বাংলা গল্প সাহিত্যের ধারায় শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্পকারেরা প্রচলিত প্রথার বেড়াগুলিকে সহজ করে ভেঙে দিয়েছিলেন নিজেদের প্রতিভা দিয়েই। আবার সেই নতুনধারাকে প্রতিষ্ঠিতও করে দিয়েছিলেন নিজেদের সৃষ্টির মাধ্যমে। শাস্ত্রবিরোধী গল্পের প্রভাব সেজন্য পরবর্তী বাংলা গল্পের স্রোতে এমন ভাবে মিশে গেছে যে তাকে স্বতন্ত্র করা যায় না।

Reference:

১. ‘এই দশক’ পত্রিকা, ১ম সঙ্কলন, মার্চ, ১৯৬৬
২. বসু, শেখর, ‘শাস্ত্রবিরোধীগল্প’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ২০

৩. 'এই দশক', প্রথম বর্ষ, প্রথম সংকলন, ফাল্গুন ১৩৭২, পৃ. ২
৪. বসু, শেখর, 'শাস্ত্রবিরোধী গল্প', এ বং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৮
৫. রায়, রমানাথ, 'বলার আছে', শেখর বসু (সম্পাদনা) : 'শাস্ত্রবিরোধী গল্প', এ বং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৪৩
৬. সেনগুপ্ত, সুব্রত, 'জামা', তদেব পৃ. ৫৫
৭. চন্দ, অমল, 'বারান্দা', তদেব পৃ. ১০৩
৮. বসু, শেখর, 'সার্সি', তদেব পৃ. ৭২
৯. বসাক, বলরাম, 'কার্পেট', সৌমব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা) : 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', গাংচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ২০৯
১০. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'ছোটগল্পের বিষয়-আশয়', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, জুন ২০০৪, পৃ. ৭১